.

**Political Science (Generic Elective – 2nd Semester)**

**GE-2: Governance : Issues and Challenges .**

**Topic no. 1. Government and Governance : concepts.**

**Concept of Globalization**

**By- Shyamashree Roy, Assistant Professor of Political Science**

**বিশ্বায়ন** (globalization) বিংশ শতকের শেষভাগে উদ্ভূত এমন একটি আন্তর্জাতিক অবস্থা যাতে পৃথিবীর বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা দৈশিক গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তঃদেশীয় পরিসরে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। এর ফলে সারা বিশ্ব একটি পরিব্যাপ্ত সমাজে পরিণত হয়েছে এবং অভিন্ন বিনিয়োগ,কর্মসংস্থান,উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দেশ যুগপৎ অংশ গ্রহণ করছে।

এটি পারস্পরিক ক্রিয়া এবং আন্তঃসংযোগ সৃষ্টিকারী এমন একটি পদ্ধতি যা বিভিন্ন জাতির সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের মধ্যে সমন্বয় ও মিথস্ক্রিয়ার সূচনা করে। এই পদ্ধতির চালিকাশক্তি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ, আর এর প্রধান সহায়ক শক্তি হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি। পরিবেশ, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক পদ্ধতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রগতি এবং মানবিক ও সামাজিক অগ্রগতি; সকল কিছুর উপরই এর সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। বিশ্বায়ন বিষয়টি নিয়ে আক্ষরিক অর্থে গবেষণা নতুন করে শুরু হলেও এই ব্যাপারটি বেশ প্রাচীনই বলতে হবে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ নিতে দেখা গিয়েছে। যদিও তখন কোন সাধারণ নীতিমালা ছিল না। হাজার বছর পূর্বে মধ্যযুগে সিল্ক রোড ধরে ইউরোপের সাথে মধ্য এশিয়া হয়ে চীনের বাণিজ্য চলতো।

## বিশ্বায়নের ধারণা

---

পরিবহন ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বিশেষ করে ১৮০০ শতকের প্রথমার্ধে বাষ্পীয় পোত ও টেলিগ্রাফের উন্নয়নের পর থেকে বিশ্বব্যাপী মানুষ বা কোম্পানিগুলোর মধ্যে ব্যাপক মাত্রায় মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধির যে প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে, তাকে বিশ্বায়ন বলে। জাতিরাষ্ট্রসমূহ ও লোকজনের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্য, চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে বিশ্বায়ন হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সমন্বয়, যার রয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিমুখ। কিন্তু বিশ্বায়নের ইতিহাসের বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে বিতর্ক ও কূটনীতি।

অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বায়নের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পণ্য, পরিসেবা এবং পুঁজি, প্রযুক্তি ও উপাত্তের অর্থনৈতিক সম্পদ। বাষ্পীয় শকট, বাষ্পীয় পোত, জেট ইঞ্জিন এবং কনটেইনারবাহী জাহাজ ইত্যাদি পরিবহনের ক্ষেত্রে কতিপয় সুবিধা নিয়ে এসেছে, সেইসাথে টেলিগ্রাফ-এর আধুনিক প্রজন্ম ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন টেলিযোগাযোগের অবকাঠামোর ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেছে। এগুলোর উন্নয়ন বিশ্বায়নের প্রধান উপাদান এবং এগুলো অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অধিকতর আন্তঃনির্ভরতার সৃষ্টি করেছে।

যদিও অধিকাংশ পণ্ডিত বিশ্বায়নের উৎপত্তি আধুনিক সময়ে হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন; তবে অনেকে এটি ইউরোপীয়দের সামুদ্রিক আবিষ্কারের মহান যুগের, অর্থাৎ নতুন পৃথিবীতে অভিযানের অনেক আগে এর ইতিহাসের সন্ধান করেন, কেউ

কেউ আবার খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের কথা বলে থাকেন। ব্যাপক মাত্রায় বিশ্বায়ন শুরু হয়েছিলো ১৮২০-এর দশকে। উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের শুরুতে বিশ্ব অর্থনীতি ও সংস্কৃতির যোগসূত্র (connectivity) খুবই দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পায়। বিশ্বায়ন পরিভাষাটি সাম্প্রতিক, ১৯৭০-এর দশক থেকে এটি বর্তমান অর্থে ব্যবহার শুরু হয়েছে।

২০০০ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বিশ্বায়নের চারটি মৌলিক দিক চিহ্নিত করেছে; যথা- (১) বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেন, (২) পুঁজি ও বিনিয়োগ সঞ্চালন, (৩) অভিগমন ও মানুষজনের বিচরণ এবং (৪) জ্ঞান বিতরণ। এছাড়াও পরিবেশগত পরিবর্তন, যেমন- বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, পানি, বায়ু দূষণের সীমা অতিক্রম এবং সমুদ্রে মাছের অত্যাহরণ বিশ্বায়নের সাথে সম্পর্কিত। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি, আর্থসামাজিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে। তাত্ত্বিক ভাষায় বিশ্বায়নকে সাধারণভাবে তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়; যথা- (১) অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন, (২) সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন ও (৩) রাজনৈতিক বিশ্বায়ন। অবশ্য কেউ কেউ আবার পরিবেশগত বিশ্বায়ন নামে অপর একটি ভাগ যোগ করে একে চারভাগে বিভক্ত করেও আলোচনা করে থাকে।

উনিশ শতকে বিশ্বায়ন আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যায়। শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বাড়িয়ে খরচ কমানোর নীতি ব্যবহার হয়, এতে দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমে যায়। অপরদিকে বর্ধিত জনসংখ্যার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদাও বাড়তে থাকে। এ শতকের সাম্রাজ্যবাদ নীতি বিশ্বায়নকে চূড়ান্ত রূপ দেয়। প্রথম ও দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধে চীনের বিরুদ্ধে বৃটেনের জয়লাভ ও ভারতে বৃটেনের আধিপত্যের কারনে চীন ও ভারত ইউরোপীয় পণ্যের বাঁধা ভোক্তা হয়ে যায়। এটা সেই সময় যখন আফ্রিকান সাব সাহারা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলো নতুন বিশ্বের অন্তর্ভূক্ত হয়। ফলে ইউরোপীয়রা এতদাঞ্চল হতে বিশেষ করে আফ্রিকান সাব সাহারা থেকে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন রাবার, হীরা, কয়লা আহরণ করে। যা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের উপনিবেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে বাড়িয়ে দেয়।

সে সময় লন্ডনবাসি সকালে চা পান করতে করতে বিশ্বের যেকোন পণ্যের অর্ডার টেলিফোনে দিতে পারত। যা আবার গ্রহণযোগ্য নির্দিষ্ট সময়ে তাদের হাতে পৌঁছাতো। সে সোনালী সময়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চমৎকার ধারা যা ১৯১৪ সালের আগস্টে থেমে যায়।

উনিশ শতক ও বিশ শতকের বিশ্বায়নের মধ্যে দুই দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। যার প্রথম দিকে আছে শতাব্দীর বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা অপরদিকে মূলধন, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

**বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা**

২০ শতকের বিশ্ব বাণিজ্যে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের ব্যপকতা, সেবা খাতের উন্নয়ন ও বহুজাতিক ফার্মের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ সময় আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ১৯ শতকের চেয়ে ২০ শতকে সেবা খাতের ব্যবসাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। অপর যে বিষয়টি এই দুই শতকের বৈশ্বিক বাণিজ্যকে পৃথক করে তা হল বহুজাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি। বহুজাতিক সহযোগিতার কারনে ১৯ শতকের তুলনায় ২০ শতকে বাণিজ্যের *আকস্মিক উন্নয়ন* ঘটে। ২০ শতক শুরুর পূর্বে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু পোর্টফোলিও বিনিয়োগ হয়, বাণিজ্য বা উৎপাদন সম্পর্কিত কোন সরাসরি বিনিয়োগ দেখা যায়নি।

২০ শতকে বাণিজ্যিক সমন্বয় ঘটে, বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা দূর কমে যায় ও পণ্য পরিবহন খরচ কমে যায়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন চুক্তি ও মতৈক্যে পৌঁছায়, ফলে সৃষ্টি হয় শুল্ক ও বাণিজ্যে সাধারণ চুক্তি, উত্তর আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মত প্রতিষ্ঠান। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাণিজ্যে শুল্ক বাধা অনেকাংশে হ্রাস করে। ১৮৯০ থেকে শুরু করে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ পর্যন্ত বাণিজ্যে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থিতিশীলতার দিকে যায়। জাতীয় পণ্য দেখভালের দায়িত্ব মানুষ নিজেই নিয়ে নেয়, তারা এটাও নিশ্চিত করে যে কোন বিদেশি পণ্য দেশীয় পণ্যের স্থান দখল সমাজে বেকারত্ব বাড়িয়ে সমাজকে অস্থিতিশীল করে তুলছে কি না। প্রযুক্তির উন্নয়ন পরিবহন খরচ কমিয়ে দিয়েছে, ১৯ শতকে পণ্য পরিবহনে যেখানে সপ্তাহ

থেকে মাসাধিক কাল লাগতে সেখানে ২০ শতকে তা কয়েক ঘণ্টা থেকে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এক মহাদেশ থেকে আরে মহাদেশে পরিবহন করা যাচ্ছে।

### মূলধন, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

আর্থিক সংকট বিবেচনায় এই দুই শতকের মাঝে আরেকটি মূল পার্থক্য হল আর্থিক ব্যবস্থা। ১৯ শতকে যা স্বর্ণ আদর্শের স্থির বিনিময় হারে ঘটে কিন্তু ২০ শতকে তাকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে উঠানামা করতে দেওয়া হয়। ১৯ শতকে দেশগুলোতে শেষ আশ্রয় হিসাবে মহাজনী ঋণ ব্যবস্থার প্রবর্তিত হয়, সেসব দেশে নয় যেগুলোতে ইতোমধ্যেই মহাজনী ঋণের কুফল প্রত্যক্ষ করেছে । এর এক শতক পরেই উত্থানশীল দেশগুলোতে দেশীয় আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রদান করা হয় যাতে ব্যাংকগুলো তারল্য সংকটে পড়লে সরকার তা অধিগ্রহণ করে তারল্য সংকট কাটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। ব্যাংকিং খাতের অস্থিতিশীলতা কাটিয়ে ওঠা অপর একটি মুল পার্থক্য। ব্যাংক সংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা ২০ শতাব্দীতে প্রথমের দিকেই শুরু হয়। ১৯ শতাব্দীতে উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর সংকট কাটিয়ে ওঠার কোন সহায়তা ছিল না । কিন্তু বর্তমান সময়ে এধরনের উদ্ধার সহায়তা অর্থনৈতিক দৃশ্যপটে একটি সাধারণ দৃশ্য।

১৯ শতকে তথ্যপ্রবাহে বিশেষ সুবিধা সৃষ্টি হয়নি। আটলান্টিক সাগরের টেলিগ্রাফ সংযোগ ও বেতার আবিষ্কারের আগে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তথ্য স্থানান্তরে অনেক সময় লাগত। তাই অর্থনৈতিক তথ্য বিশ্লেষণ করা একটু কঠিন। যেমন কুঋণ ও সুঋণের মধ্যে পার্থক্য করা খুব সহজ কাজ নয়। আর তাই এই অপ্রতিসম তথ্য প্রবাহ আন্তর্জাতিক বিনিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে রেলওয়ে ঋণপত্র কে একটা ভাল উদাহরন হিসাবে বলা যায়। তাছাড়া চুক্তি সংক্রান্ত জটিলতা ও পরিলক্ষিত হয়। কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে পৃথিবীর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করা কষ্টকর ছিল, যা স্পষ্টতই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এক বড় বাধা। কতিপয় সামষ্টিক অর্থনৈতিক নিয়ামক যেমন ঝুঁকি বিনিময়, অনিশ্চিত আর্থিক নীতি ও বিনিয়োগ কে ব্যহত করে। ১৯ শতকে যুক্তরাষ্ট্রে হিসাব বিজ্ঞানের ধারণা তুলনামূলকভাবে অনুন্নত ছিল। তবে বৃটেনের বিনিয়গকারীরা এ অবস্থার উন্নয়নে উদীয়মান অর্থনীতির বাজারগুলোকে তাদের প্রায়োগিক জ্ঞান দিয়ে সহায়তা করে।[১৩]

#### প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ফলাফলঃ বিশ্বায়নে ধ্বস

"আধুনিক বিশ্বায়ন"-এর প্রথম পর্ব ২০ শতাব্দীর শুরুর দিকে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের কারনে ক্ষয়ে যেতে থাকে। তখন ইউরোপীয় শাসিত অঞ্চলগুলো 'অন্যদের' এমনসব ব্যাপারের সম্মুখীন হয় যাতে তারা নিজেরাই বিশ্বের নীতিনৈতিকতার অভিভাবক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বর্ণবাদী ও অসম দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তারা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল হতে সম্পদ আহরণ শুরু করে। ১৮৫০ এর দিকে বিশ্ব বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রারম্ভ থেকে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পরার পূর্ব পর্যন্ত সময় তৃতীয় বিশ্বে সরাসরি উপনিবেশ শাসনকে উৎসাহিত করেছে। যখন অন্যান্য ইউরোপীয় মুদ্রা চারিদিকে ভালভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন সম্পদ অর্জনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[১৪] তাই সাহিত্যিক ভিএম ইয়েটস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারন হিসাবে বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর সমালোচনা করেছেন। বলা চলে এই অর্থনৈতিক শক্তিগুলোই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য আংশিক দায়ী। যেমন বলা যায় ২০ শতাব্দীর আফ্রিকায় ফ্রান্সের উপনিবেশগুলোর কথা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আগে আফ্রিকায় ফ্রান্সের তেমন কোন লক্ষ-উদ্দেশ্য ছল না। সে দিক থেকে ফ্রান্স সেগুলোকে হৃত রাষ্ট্র হিসাবেই গণ্য করত। ফ্রান্সের কাছে আফ্রিকার অর্থনীতির চেয়ে সামরিক শক্তির গুরুত্ব বেশি পায়। সেটা তারা একটু পরে হলেও বুঝতে পারে। ফ্রান্স আর্মিতে আফ্রিকানদের খাটো চোখে দেখা হত। ১৯১৭ সালে উপনিবেশ শাসনের জন্য যখন আর্থিক প্রণদনার বিষয়টি সামনে আসে তখন ফ্রান্স খাদ্য ঘাটতিতে পরে। এটি ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার পর যখন ফ্রান্স কৃষি ক্ষেত্রে পিছিয়ে যায় কেননা ১৯১৭ সালে তাদের সার কীটনাশক ও কৃষির যন্ত্রপাতির অভাব ছিল।[১৬]

#### দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর বিশ্বঃ বিশ্বায়নের পুনরুত্থান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্ব নেতাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্ব বাণিজ্যিক বাঁধাগুলো দূর হয়, ফলে অল্প হলে তা বিশ্বায়নে ভূমিকা রাখে। বিশ্ব নেতাদের চেষ্টায় ব্রেটন উড সম্মেলনে তৎকালীন অগ্রগণ্য নেতারা বিশ্ব অর্থনীতি ও বাণিজ্যের একটি

কাঠামো প্রণয়ন করেন। বিশ্বায়নের গতি সন্তোষজনক হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণের জন্য আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ ভিত্তিক বহুজাতিক কর্পোরেশন গুলোর ব্যপকতা, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন বিশ্বায়নকে আরও বেগবান করে। ব্রিটানিকা বিশ্বকোষ অনুসারে ঐ সময়ে পশ্চিমা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অনেক আবিষ্কারও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।[১৭] আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসার বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ঐ রকম আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে উন্নয়ন ও পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক ব্যাংক(বিশ্বব্যাংক), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল। শুল্ক ও বাণিজ্যের সাধারণ চুক্তির অধিনে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সম্মেলন অনুষ্ঠান ও বাণিজ্যের বাঁধাগুলো দূর করে মুক্ত বাণিজ্যের পথ প্রসারিত হয়, প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং পরিবহন খাতে খরচ কমে যায়। ইত্যাদি কারনে বিশ্বায়ন ত্বরান্বিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের বাঁধাগুলো উল্লেখযোগ্য পরিমানে কমে যায়। GATT এর মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ উদ্যোগ গৃহীত ফলত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়।

নিম্নোক্ত কার্যপরিধি নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা:

- মুক্ত বাণিজ্য বৃদ্ধি
- শুল্ক দূর করা, শুল্কহীন বা অল্প শুল্কে 'মুক্ত বাণিজ্যিক এলাকা' তৈরি।
- পরিবহন খরচ কমানো, সমুদ্রপথে পরিবহনের ক্ষেত্রে কন্টেইনার ব্যবস্থার প্রবর্তনে খরচ কমে যায়।
- পুঁজি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দূর করা বা কমানো
- স্থানীয় ব্যবসায় ভর্তুকি কমানো, দূরকরা বা সমন্বয় সাধন করা
- বিশ্ব কর্পোরেশনগুলোর জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা করা
- অধিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে অধিকাংশ রাষ্ট্রে মেধাসত্ব আইনের সমন্বয়
- মেধাস্বত্বের আধিরাষ্ট্রিক স্বীকৃতি ( যেমন চীনের মেধাস্বত্বে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি)

পশ্চিমা সাংস্কৃতিক শিল্পের বাজার ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নকে চালিত করেছে, এটাকে প্রথমে ভাবা হচ্ছিল বিশ্বব্যাপী সমসংস্কৃতির বিন্যাস হিসাবে কেননা, তখন প্রথাগত বৈচিত্রের বিনিময়ে বিশ্বব্যাপী আমেরিকান সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ করা গেছে। যা হোক, অচিরেই বিশ্বায়নের বিপরীতে একটি সুস্পষ্ট আন্দোলন প্রতীয়মান হয়, যা দেশীয় সাংস্কৃতির স্বাতন্ত্য রক্ষার জন্য শুরু হয়।

উরুগুয়ে সম্মেলনের (১৯৮৬-১৯৯৪) মাধম্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সৃষ্টি হয়। যা বিশ্ব বাণিজ্য সম্মপর্কিত বাঁধাগুলো দূর করে বাণিজ্যের জন্য সকলের সমান ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। শুল্ক হ্রাস ও বাণিজ্যিক বাঁধা দূর করতে অন্যান্য দ্বিপাক্ষীয় ও বহুপাক্ষীয় বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যেমন ইউরোপের ম্যাস্ট্রিক্ট চুক্তি, আমেরিকান মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ইত্যাদি।

১৯৭০ সালে যেখানে রপ্তানি বৃদ্ধি ছিল ৮.৫% ২০০১ সালে তা ১৬.২% এ উত্তীর্ণ হয়।[1] নব্বইয়ের দশকে ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের মাধ্যমে সেইসকল জায়গা থেকে কাজ করে নেওয়া হয় যেখানে কম মজুরি দিতে হয়। যেমন বিভিন্ন হিসাব সংক্রান্ত কাজ, সফটওয়ার ডেভলপমেন্ট, বিভিন্ন প্রকৌশল নকশা ইত্যাদি।

> ২০০০ দশকের শেষের দিকে অনেক শিল্প সমৃদ্ধ দেশে মন্দা দেখা দেয়। তাই অনেক বিশ্লেষক মনে করেন বছর ধরে চলতে থাকা এই বর্ধিষ্ণু সংহতির পরে পৃথীবি এখন বিশ্বায়নের বিপরীতে চলছে। সম্প্রতি চীন জার্মানকে ডিঙিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছ

**বিশ্বায়নের বিতর্কের উভয় পক্ষেই মতামত বিদ্যমান**। প্রবক্তারা কম সুযোগ ব্যয়, ইতিবাচক বৃদ্ধি উত্পাদন, এবং বাজারের অস্থিরতা হ্রাস দাবি করে। একই সময়ে, বিরোধীরা দেশীয় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হ্রাস, দেশ ও বিশ্বের অব্যবস্থাপনা ব্যয় এবং মজুরি স্থিরকরণের ঘোষণা দেয়।

## বিরোধী বিশ্বায়ন দর্শন

উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বায়নের বিষয়ে তাঁর মতামত নিয়ে খুব সোচ্চার ছিলেন এবং উত্তর আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (নাফটা) মতো চুক্তির আওতায় মুক্ত বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে রক্ষাকারী অবস্থান নিয়েছিলেন, আমদানিতে আরও বেশি করের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং আরও কম বহুজাতিক বাণিজ্য চুক্তি। বিদেশী পণ্য আমদানি ও ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করতে তিনি শুল্কও বাড়িয়েছেন।

অর্থনীতিবিদরা বিশ্বায়নের সার্বজনীন সুবিধাগুলি উত্সাহিত করতে যতই তত দ্রুতই না কেন, কিছু রাজনীতিবিদ এবং অন্যান্য অর্থনীতিবিদ গ্লোবালাইজেশনকে এমন একটি শক্তি হিসাবে রূপান্তরিত করেন যা গৃহকর্মী চাকরি হরণ করে। এই দ্বন্দ্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত দেশগুলি জুড়ে চূড়ান্ত সুরক্ষাবাদ থেকে শুরু করে বাণিজ্য বাধাগুলির মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উদাহরণের মতো সম্পূর্ণ খোলামেলা হওয়াতে একটি মতবিরোধ তৈরি করেছে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বায়নকে সাধারণত পণ্য, পরিষেবা, মূলধন এবং প্রযুক্তির বিশ্ব বাণিজ্য বৃদ্ধি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। বাণিজ্যের এই বৃদ্ধি বিশেষত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশ এবং চীন যেমন উদীয়মান বাজারের মধ্যে তীব্র হয়েছে।

বৈশ্বিক বাণিজ্য বৃদ্ধির পেছনে রয়েছে অনেক কারণ। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় ধ্বংসযজ্ঞ আমেরিকা এবং একটি শিল্প পরাশক্তি এবং রফতানিকে লাফিয়ে তুলতে সহায়তা করেছিল। স্বল্প পরিবহন ব্যয় বাণিজ্যের ব্যয় হ্রাস করেছে, প্রযুক্তিগুলি পুরোপুরি কিছু প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করেছে এবং উদারনৈতিক অর্থনৈতিক নীতিগুলি বাণিজ্যে রাজনৈতিক বাধা হ্রাস করতে সহায়তা করেছে।

যদিও ব্যয় হ্রাস বাণিজ্যকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের পিছনে বৃহত্তম চালক হলেন সরবরাহ-চাহিদা অর্থনীতি এবং আমদানিকারক এবং রফতানিকারক উভয় পক্ষেই ব্যয় বাড়ানোর আকাঙ্ক্ষা।

## উপকারিতা

বিশ্বায়নের মূল সুবিধা হ'ল তুলনামূলক সুবিধা – তা হ'ল, অন্য দেশের তুলনায় কম সুযোগ ব্যয়ে পণ্য বা পরিষেবা উত্পাদন করার এক দেশের দক্ষতা। ধারণাটি পৃষ্ঠতলে সহজ বলে মনে হচ্ছে, আরও গভীরভাবে পরীক্ষা করা হলে এটি দ্রুত পাল্টে যায়। তত্ত্বটি পরামর্শ দেয় যে দুটি দেশ বিভিন্ন

মূল্যে দুটি পণ্য উত্পাদন করতে সক্ষম যেখানে তুলনামূলক সুবিধা বিদ্যমান সেখানে রফতানি করে সর্বাধিক উপকৃত হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি উন্নয়নশীল দেশের সিমেন্ট উত্পাদন করতে তুলনামূলক সুবিধা থাকতে পারে এবং সেমিকন্ডাক্টর উত্পাদন করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনামূলক সুবিধা থাকতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় আরও বেশি দক্ষতার সাথে সিমেন্ট উত্পাদন করতে সক্ষম হতে পারে, তবুও আমেরিকা তার তুলনামূলক সুবিধার কারণে অর্ধপরিবাহীগুলিতে মনোনিবেশ করা আরও ভাল। এই কারণেই বিশ্বায়নের সমস্ত ক্ষমতার দেশগুলির মধ্যে বিশ্বব্যাপী ব্যবহারের চালক হিসাবে শক্তিশালী।

গবেষণামূলক প্রমাণগুলি প্রমাণ করে যে বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট ধনী সমৃদ্ধ দেশগুলিতে একটি ইতিবাচক বৃদ্ধির প্রভাব ঘটে। বিনিয়োগকারী এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে, বিশ্বায়নও আউটপুট এবং ব্যবহারের অস্থিরতা হ্রাস করার সুযোগ সরবরাহ করে, যেহেতু পণ্য এবং পরিষেবাগুলি বৃহত্তর স্বাচ্ছন্দ্যে আমদানি বা রফতানি করা যায়। পণ্য ও পরিষেবাদিগুলির উত্পাদন আরও স্থিতিস্থাপক হলে সরবরাহ ও চাহিদার তুলনায় কম "বুদবুদ" উদ্ভূত হয়।

## অপূর্ণতা

গ্লোবালাইজেশন প্রায়শই দেশীয় সংস্থা এবং কর্মীদের কাছ থেকে চাকরি কেড়ে নেওয়ার জন্য সমালোচিত হয়। সর্বোপরি, উন্নয়নশীল দেশ থেকে আমদানি দাম কমিয়ে দিলে, মার্কিন সিমেন্ট শিল্পটি ব্যবসায়ের বাইরে চলে যাবে, এমনকি খরচ বাড়লেও। ক্ষুদ্র আমেরিকার সিমেন্ট সংস্থাগুলি প্রতিযোগিতা করা এবং শ্রমিকদের বেকার রেখে যাওয়ার সম্ভাবনা বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব করবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত সিমেন্ট শিল্প সম্ভবত উল্লেখযোগ্যভাবে দীর্ঘায়িত হ্রাস পাবে।

দ্বিতীয় সমালোচনা হ'ল অপব্যবস্থাপিত হলে কোনও দেশের নিজস্ব কল্যাণের তুলনামূলক বা নিখুঁত সুবিধার উচ্চ মূল্য। উদাহরণস্বরূপ, চীন বিস্তৃত পণ্য উত্পাদন ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধার জন্য কার্বন ডাই অক্সাইডের বিশ্বব্যাপী নির্গমনকারী হয়ে উঠেছে। অন্যান্য দেশের কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন – অপরিশোধিত তেল খনন করার ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা থাকতে পারে এবং এই ক্রিয়াকলাপগুলি থেকে প্রাপ্ত উপার্জনকে ভুলভাবে পরিচালনা করতে পারে।

বিশ্বায়নের চূড়ান্ত অসুবিধা হ'ল শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, যা কর্পোরেট মুনাফার ক্ষতি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও সমৃদ্ধ দেশের সফ্টওয়্যার বিকাশে উচ্চ তুলনামূলক সুবিধা থাকে তবে তারা বিশ্বজুড়ে সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের দাম বাড়িয়ে তুলতে পারে, যার ফলে বিদেশী সংস্থাগুলির বাজারে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হয়ে পড়ে।